অনলাইন সাময়িকী

সাহিত্য বৈচিত্র্য

অসীম পুলকে, সাহিত্য চলকে

শীত সংখ্যা

১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অনলাইন সাময়িকী
সাহিত্য বৈচিত্ত্য
অসীম পুলকে, সাহিত্য চলকে

বর্ষ ০৬ ■ সংখ্যা ০২ ■ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

শীত সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
মনসুর আহমদ চৌধুরী

সম্পাদক
হাসান ইব্রাহীম

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুহিব্বুল ইসলাম জুবায়ের

প্রচ্ছদ
জুবায়ের হাসান

প্রকাশনায়
বৈচিত্ত্য প্রকাশন

আমাদের সাথে থাকুন...
+8801540-101565
+8801755-867468
www.sahittabaicitta.com
sbaicittabd
sahityabaicittabd20
sahityabaicittabd20

যাদের লেখা পড়ব...

প্রবন্ধ
একজন বিবাগী, তৌসিফ রেজা আশরাফী

জীবন থেকে নেয়া
নোবিতা আদনান, আহমেদ আরসলান

গল্প
সাজমুন নাহার

ছড়া ও কবিতা
জান্নাতুল ফেরদৌস হলি, বাছিত ইবনে হাবীব, ফেরারী মুসাফির, এ এস এম কবির হোসাইন, প্রিয়সী মনি, ওয়াহিদ ওয়াসেক, মাহমুদা জিয়াসমিন, এম এইচ ইউ রায়হান, তালহা, স্নেহাশীষ বড়ুয়া, সাবেকুন নাহার, রং ছাড়া তুলি(কা), মাজহারুল ইসলাম পলিন, সানজিদা রহমান আইরিন

সাহিত্য বৈচিত্র্য

সম্পাদকীয়

শীত আসে নীরবে। কুয়াশার মতোই সে ঢেকে দেয় দৃশ্যমান পথ, কিন্তু উন্মুক্ত করে দেয় ভেতরের জমে থাকা প্রশ্ন, বেদনা আর অনিশ্চয়তা। আগুনপোহানোর শীত আমাদের কাছে শুধু ঋতু নয়; এ এক উপলক্ষ, যখন মানুষ নিজের ভেতর আর রাষ্ট্র নিজের বিবেকের দিকে তাকায়।
এই শীত আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে কিছু রক্তাক্ত সত্য।

গত ১২ ডিসেম্বর ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদী গুলিবিদ্ধ হন এবং ১৮ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে সিঙ্গাপুরে শাহাদত বরণ করেন। ওসমান হাদীর শাহাদাত কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আততায়ীর গুলিতে তাঁর জীবন থেমে যাওয়ার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও আজও সেই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি।
ওসমান হাদীকে গুলি করা হয়েছিল খুব কাছ থেকে। কিন্তু বিচারটা রাখা হয়েছে খুব দূরে, এত দূরে যে রাষ্ট্রও নাকি পথ হারিয়ে ফেলেছে। আততায়ীর বন্দুকের গুলি লক্ষ্যভেদে নির্ভুল ছিল, অথচ রাষ্ট্রের তদন্ত যেন ইচ্ছে করেই চোখ বেঁধে হাঁটে। এত দিনেও বিচার না হওয়া প্রমাণ করে যে এই দেশে খুন দ্রুত হয়, কিন্তু ন্যায়বিচার হাঁটতে হাঁটতে শীতকাতুরে হয়ে পড়ে।
রাষ্ট্রযন্ত্র যেন বিশেষভাবে উদাসীন।
সে যেন বলছে-
"মরলে মরো, ফাইলটা পরে দেখা যাবে।"
এখানে রক্ত শুকায়, কিন্তু কালি শুকায় না!

এই বিচারহীনতা শুধু একটি পরিবারের শোক নয়; এটি সমাজের সম্মিলিত ক্ষত। শীতের সকালে শিশির যেমন দেখতে স্বচ্ছ, তেমনি বিচারহীনতা প্রথমে নীরব—কিন্তু গভীরে তা ভীষণ ঠান্ডা, ভীষণ নির্মম।

এই শীত আরও একটি বড় শূন্যতার সাক্ষী। বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকাল আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনে দেয়। মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে বলা যায় তিনি ছিলেন একটি সময়ের প্রতিনিধি, একটি রাজনৈতিক ভাষার ধারক। তাঁর প্রস্থান আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ইতিহাস দীর্ঘ এবং নির্মমভাবে স্মরণশীল।

তবে বেগম জিয়ার ঐতিহাসিক জানাযাই ইতিহাসের আদালতে তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের চূড়ান্ত সাক্ষী হয়ে জনসমর্থনের এক অনস্বীকার্য অধ্যায় লিখে দেয়।

এই সব ঘটনার মাঝেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আসন্ন নির্বাচন। শীত যেমন জলকে জমাট বাঁধায়, তেমনি নির্বাচন জমাট বাঁধায় জাতির আশা ও আশঙ্কা। প্রশ্ন শুধু কে জিতবে নয় প্রশ্ন হলো, গণতন্ত্র কি তার উষ্ণতা ধরে রাখতে পারবে, নাকি আরও কুয়াশায় ঢাকা পড়বে?

বিশ্ব রাজনীতির দিকে তাকালে শীতের এই সময় আরও কঠিন বাস্তবতা চোখে পড়ে। আমেরিকা পেশীশক্তি ব্যবহার করে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে অপহরণের মত ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিই এখনো শেষ কথা। সার্বভৌমত্ব, আইন, ন্যায় সবই অনেক সময় ক্ষমতার শীতে জমে যায়।
এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে শীত আমাদের একটি মৌলিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় আমরা কোন আগুনে নিজেদের গরম করব? ক্ষমতার আগুনে, নাকি ন্যায় ও মানবিকতার আলোয়?
"সাহিত্য বৈচিত্র্য"এর শীত সংখ্যা তাই নিছক ঋতুভিত্তিক সংকলন নয়। এটি সময়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ব্যথার সঙ্গে সংলাপ এবং নীরবতার ভেতর সত্য উচ্চারণের একটি প্রয়াস। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে আমরা এই শীতে খুঁজতে চাই বিবেকের উষ্ণতা।

এই সংখ্যার প্রতিটি পাতায় যাঁদের লেখনী উষ্ণতা ছড়িয়েছে তাঁদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

এই শীত সংখ্যাটি নির্ভুল করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল; তদুপরি কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের অবগত করবেন।

-সম্পাদক

প্রবন্ধ

হিমাঙ্ক

-একজন বিবাগী

শীতকাল ছিল আমার কাছে শান্ত, সরল আর ভীষণ আপন এক ঋতু। ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ হলেও আমি অপেক্ষা করতাম শুধু শীতের আগমনের কবে আসবে শীত? কারণ ছোটোবেলা থেকেই অতিরিক্ত ফাস্টফুড খেতে খেতে শরীরে জমে গিয়েছিল বাড়তি মেদ, যার ফলে ঠান্ডা পরিবেশ ছাড়া আমার চলাফেরা ভীষণ কষ্টকর হয়ে উঠত।

বাকি ঋতুগুলোতে অতিরিক্ত গরমে আমার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে যেত। সারাদিন বাসায় এসি কিংবা ফ্যানের নিচে বসে থাকতাম আর বাসার বাইরে পা রাখলেই মনে হতো, গরমে বুঝি সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছি।

যাই হোক, এবারের গল্পটা একটু ভিন্ন। শীতের আগমন হওয়ার আগেই ধরা দিল এক অজানা লিলুয়া বাতাস। সে বাতাস পুরোপুরি ঠান্ডা ছিল না, আবার উষ্ণও না মাঝামাঝি এক অদ্ভুত অনুভূতি। যা শরীরের চেয়ে বেশি ছুঁয়ে গেল মনকে।

ফ্যান, এসি আর শীতকাল ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়াই যেখানে আমার কাছে কঠিন ছিল, সেখানে হঠাৎ করেই সেই লিলুয়া বাতাস এসে সম্পূর্ণ চিত্রটাই পাল্টে দিল। শুরু হলো নতুন এক অনুভূতি, নতুন এক ভাবনা, নতুন এক উপলব্ধি। মনজুড়ে ধরা দিল এক অদ্ভুত মাধুর্য।

পরবর্তীতে বুঝলাম এতদিন যা বিশ্বাস করতাম, তা আসলে ছিল মনের ভুল। অতিরিক্ত ফাস্টফুড খাওয়ার জন্য শরীরে মেদ হয়ে গরম অনুভব হতো আর শীতকাল বা ফ্যান এসি ছাড়া বাইরে বের হলেই যে গরমে সিদ্ধ হয়ে যাব, সেটি ছিল আমার ভয়, আমার কল্পনা, আসলে এইরকম কিছুই না।

আর সেই ভুল আর ভয় ভেঙে দিয়েছিল অজানা সেই লিলুয়া বাতাস। নতুন এক আমি কে সৃষ্টি করেছিল কিন্তু সেই লিলুয়া বাতাস কে আমি ধরতে বেরিয়ে পড়েছিলাম, যা কি-না দিনশেষে আমার কাল হয়ে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে সেই লিলুয়া বাতাস ও কমতে শুরু করল।

অবশেষে শীতের আগমন হলো। লিলুয়া বাতাসও ঠিক তেমনি অজানা ভাবেই হারিয়ে গেল। কিন্তু যাওয়ার আগে সে ঠিক করে দিয়ে গেল আমার সব ভুল, ভ্রান্তি, জল্পনা আর কল্পনা। হঠাৎ করে আসা এক অচেনা লিলুয়া বাতাস যে বদলে দিয়েছিল আমার ভাবনার দিগন্ত, তৈরি করে দিয়ে নতুন এক আমি'কে।

মানুষ নিজের তৈরি করা খাঁচায় নিজেই বন্দি থাকে, যতক্ষণ না বাইরের কোনো শক্তি তাকে ধাক্কা দিচ্ছে।

লেখক: শিক্ষার্থী, আইন ও বিচার বিভাগ,
মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, সিলেট

শীতে কম্বল নয়, দরকার রাষ্ট্রের সংবেদনশীল মানবিক উষ্ণতা

-তৌসিফ রেজা আশরাফী

বাংলাদেশ ষড় ঋতুর দেশ। প্রতিটি ঋতুরই রয়েছে তার আলাদা আলাদা রূপ ও বৈশিষ্ট্য। ঠিক একইভাবে শীতকালেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলা বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীতকাল। শীতকালের হিমেল হাওয়ায় তনুমন হারিয়ে যায় এক অন্য জগতে। সকালের শিশিরভেজা ঘাস, খেজুরের রস, বাহারি পিঠা সব মিলিয়ে মনের মধ্যে এক অন্য রকম আনন্দ ও উচ্ছ্বাস কাজ করে।

কিন্তু একই শীত অন্য দিকে নিয়ে আসে অসহনীয় বিপর্যয়। ছিন্নমূল ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য এই শীতের ভূমিকা প্রতিনায়কের ন্যায়। শহরের ফুটপাত, গ্রামের খড়কুটো ও চরাঞ্চলের জন্য শীতকাল এক অভিশাপ। শীত যেমন শিশুদের কাঁপিয়ে তোলে, ঠিক একইভাবে বৃদ্ধদের শ্বাস চেপে ধরে। এই দুই শ্রেণির মানুষ শীতকালে মহা বিড়ম্বনার মুখোমুখি হন।

ডিসেম্বর এলেই কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে মাঠ ও রাস্তা-ঘাট। সকাল আটটাতেও সূর্যের দেখা মেলে না। দরিদ্র মানুষের জন্য এই শীত শুধু ঋতুই নয়, বরং অনিশ্চয়তার আরেক নাম। যাদের শরীরে গরম কাপড় নেই, মাথার ওপর নেই শক্ত ছাদ তাদের কাছে প্রতিটি রাত যেন মৃত্যুর কাছাকাছি।

শীতকালে ঠান্ডাজনিত রোগের এক মচ্ছবের দেখা মেলে। ২০২৩-২৪ বর্ষে শীতজনিত রোগে ২৮১ জন মৃত্যুবরণ করেন। তাছাড়া IEDCR-এর গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশে শীতকালে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ ১.৭৪% থেকে ২%। এছাড়া গত বছরের এক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে শীতজনিত অসুস্থতার কারণে সারাদেশে আড়াই লক্ষাধিক মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইন্সটিটিউটে ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২৪ সালের ঢাকার শিশু হাসপাতালে জানুয়ারির প্রথম ১১ দিনে ৭৪ জন শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছিল।

প্রচণ্ড শীতে অনেক মানুষের কাজ কমে যায়। দিনমজুর, কৃষি-শ্রমিক, ভ্যানচালক, নির্মাণশ্রমিকরা পর্যাপ্ত কাজ না পাওয়ায় তাদের আয় কমে যায়। ফলে মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণেও হিমশিম খেতে হয়। একদিকে নির্মম শীত, অন্যদিকে ক্ষুধা দুটো একসাথে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটায়।

প্রতি বছর নানা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ছাত্রসমাজ, বোদ্ধা মহল ও বিত্তবান মানুষেরা শীতবস্ত্র বিতরণে এগিয়ে আসেন। কিছু উষ্ণ কম্বল, সোয়েটার আর মাফলার সাময়িক স্বস্তি দিলেও এটি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কিন্তু এই কম্বলগুলোর অধিকাংশই হয় নিম্নমানের, যা শুধু নামমাত্র কম্বল। এসব কম্বল থেকে তেমন একটা উপকার হয় না সুবিধাভোগীদের। তারপরেও একটি বাংলা প্রবাদ আছে "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।" নিরাশার মাঝে সামান্য আশার আলো থাকা ভালো।

গত বছর শেষে বা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সারা দেশে শীতার্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৬ লাখ ৭৯ হাজার পিস কম্বল ও শীতবস্ত্র কেনার লক্ষ্যে ৩৩ কোটি ৮৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। সুধী মহলে এই বরাদ্দকৃত কম্বলের পরিমাণ, বণ্টন ও গুণগত মান নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। এছাড়া বিভিন্ন বড় বড় সংস্থা স্থানীয় পর্যায়ে কম্বল বিতরণ করেছে।

এই শীতবস্ত্র বিতরণের পরও একটি সমস্যা থেকে যায়, যা হলো শীতবস্ত্র বিতরণ অনেক সময় রাজনৈতিক প্রভাব, পরিচিত অপরিচিতের ভিত্তিতে বণ্টন ও শহরকেন্দ্রিকতার এই তিন সমস্যায় জর্জরিত থাকে। অথচ প্রকৃত দরিদ্র মানুষ বাস করে চরাঞ্চল, পাহাড়ি জনপদ ও গ্রামে। অনেক সময় তারাই বঞ্চিত হয়। আবার অনেকে সুষম বণ্টনের অভাবে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করার পরও শীতবস্ত্র পান না, যার ফলে তারা ব্যথিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়।

মোদ্দাকথা, শীত ঋতু পরিবর্তনের পরম্পরায় প্রতিবছরই আসে। এটি নতুন বা অপ্রত্যাশিত কোনো দুর্যোগ নয়। প্রতি বছর শীত এলে কিছু মানুষ, বিভিন্ন গণমাধ্যম ও পত্র-পত্রিকায় গরিব মানুষের দুর্ভোগের কথা নতুন করে আবিষ্কার করে। এর মানে দাঁড়ায় রাষ্ট্রীয় কোনো প্রস্তুতি এখনো পরিকল্পিত নয়; এটি সরকারিভাবে প্রতিক্রিয়াশীল উদ্যোগ।

রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু শীত এলেই এই মৌলিক অধিকারগুলো দরিদ্র মানুষের জন্য প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। যদি শীত আগমনের পূর্বেই সরকারি উদ্যোগে দরিদ্র মানুষগুলোর তালিকা হালনাগাদ করা হয়, অস্থায়ী শীতনিরোধক সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা হয়, চরাঞ্চল ও পাহাড়ি জনপদের জন্য আগাম কম্বল মজুদ করা হয় এবং ফুটপাতবাসী ও ভাসমান মানুষগুলোর জন্য বিশেষ উষ্ণ আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা হয় তবে প্রকৃত অর্থে এই দরিদ্র মানুষগুলোর কষ্ট লাঘব করা সম্ভব।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, শীত তীব্র হওয়ার পর হঠাৎ তড়িঘড়ি করে কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণ শুরু করা হয়। যেখানে সুষম বণ্টনের অভাব, প্রকৃত সুবিধাভোগীদের বঞ্চিত হওয়া এবং তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এই তিনটি সমস্যাই প্রকট হয়। এছাড়াও ঠান্ডাজনিত রোগব্যাধি মোকাবিলার জন্য গ্রামীণ ও উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত ওষুধ, চিকিৎসক এবং চর ও দুর্গম এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছানোর সুব্যবস্থা করা হলে মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে কমানো সম্ভব।

শীতবস্ত্র বিতরণ কোনো দয়া নয়, দায়মুক্তিও নয়, এটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। নাগরিক শুধু ভোট দেওয়ার জন্য নয়, বেঁচে থাকা ও নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার নিয়েই রাষ্ট্রের অংশ হয়। শীতের দুর্ভোগ প্রতি বছর প্রমাণ করে আমাদের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এখনো যথেষ্ট পরিকল্পিত ও টেকসই হয়নি। কাঠামোগত শৃঙ্খলা ও মানবিক ব্যবস্থাপনার অভাবে যদি গরিবের শীতের কষ্ট প্রতি বছর একই রকম থাকে, তাহলে সমস্যা প্রকৃতির নয় সমস্যা আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার।

লেখক: শিক্ষার্থী ও লেখক,
সৈয়দপুর, নীলফামারী

জীবন থেকে নেয়া

শীতের উষ্ণতা

-নোবিতা আদনান

শীতকাল। প্রকৃতির এমন এক ঋতু, যা বারবার আমাকে শৈশবের মিষ্টি স্মৃতিতে টেনে নিয়ে যায়। ছোটবেলার সেই দিনগুলো, যখন সূর্য উঠতে দেরি করত আর আমরা গায়ে লেপ জড়িয়ে বসে থাকতাম চুলার উষ্ণতার জন্য। শীতের সেই মায়াবী পরিবেশ যেন আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর গল্পের পটভূমি হয়ে রয়েছে।

আমাদের গ্রামে শীতকালের প্রতিটি সকাল কুয়াশায় ঢাকা থাকত। ভোরবেলা উঠেই মনে হতো পুরো পৃথিবী যেন মেঘের চাদরে ঢেকে গেছে। দূরের গাছগুলো অস্পষ্ট হয়ে থাকত আর সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত সবকিছু এক রহস্যময় আবহে আবৃত থাকত।

একদিন খুব ভোরে বাবা আমাকে নিয়ে খেজুরের রস সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিলেন। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কুয়াশা ঠেলে সামনে এগোচ্ছিলাম। দূরে কোনো এক জায়গা থেকে মোরগের ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। বাবার হাতে ছিল একটা মাটির কলস, যা খেজুরের রসে ভরে উঠছিল। সেই রসের গন্ধে যেন পুরো শীতের সৌন্দর্য ধরা ছিল।

আমাদের ছোট ঘরটায় শীতকালে সবাই মিলে পাশাপাশি শুতাম। ঘুম থেকে উঠতে চাইতাম না কারণ লেপের উষ্ণতা ছেড়ে ঠাণ্ডা মেঝেতে পা রাখার সাহস পাওয়া খুব কঠিন ছিল। মা বারবার ডাক দিতেন, "উঠবি না? রোদ উঠেছে, পিঠা খাবি তো!" মায়ের এই ডাকেই দিনের শুরুটা আনন্দে ভরে উঠত।

মা পিঠা বানাতেন সকাল সকাল। তার ভাপা পিঠার গন্ধ যেন লেপের উষ্ণতার চেয়েও বেশি আকর্ষণ করত। আমরা সবাই মিলে বসে গরম গরম পিঠা খেতাম। সেই সময় মনে হতো শীতের ঠাণ্ডা আসলে সুখেরই আরেক রূপ।

শীতকালে গ্রামে খেজুরের রস আর পাটালি গুড়ের সময়টা ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। পাড়ার বড়রা সবাই মিলে রস জ্বালানোর আয়োজন করত। সেই সময়ের সবচেয়ে মজার অংশ ছিল গরম রস খাওয়া। আমরা ছুটে যেতাম বড়দের কাজ দেখতে আর তারা আমাদের মাটির ভাঁড়ে গরম রস ঢেলে দিত। পাটালি বানানোর পুরো প্রক্রিয়াটা ছিল একধরনের উৎসব। বড় হাঁড়িতে রস জ্বালানো হচ্ছিল আর তার ধোঁয়া বাতাসে ভাসছিল। আমরা ছোটরা সেই ধোঁয়া দেখতে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতাম।

শীতকাল মানেই ছিল আমাদের গ্রামের মেলা। মেলার মাঠে যাওয়ার জন্য আমরা সকাল থেকেই প্রস্তুত হয়ে যেতাম। নতুন কাপড় পরে হাতে কয়েকটা টাকা নিয়ে মেলার দিকে ছুটতাম। মেলায় মাটির খেলনা, কাঠের ঘোড়া আর মিষ্টির দোকান ছিল আমাদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

মেলার সবচেয়ে মজার অভিজ্ঞতা ছিল নাগরদোলা। আমি প্রথমবার নাগরদোলায় উঠেছিলাম শীতের এক বিকেলে। ঠাণ্ডা বাতাসে যখন নাগরদোলা ঘুরতে শুরু করল, মনে হলো আমি যেন আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছি। সেই অনুভূতি আজও আমার মনে উষ্ণতা এনে দেয়।

শীতকালের রাতগুলো ছিল গল্পের জন্য। আমাদের উঠোনে মাটির চুলার পাশে সবাই গোল হয়ে বসতাম। মা বা দাদি গল্প বলা শুরু করতেন। সেই গল্পের মধ্যে থাকত গ্রামের ভূতের কাহিনি, রাজা-রানির উপাখ্যান আর প্রকৃতির নানা রহস্যময় ঘটনা।

একবার দাদি বলেছিলেন, "শীতের রাতগুলো হলো প্রকৃতির সবচেয়ে গোপন সময়। তখন তারকা আর কুয়াশার মাঝে লুকিয়ে থাকে পুরনো দিনের গল্প।" দাদির কথাগুলো আমাকে আজও ভাবায়। মনে হয়, সত্যিই শীতকালের রাত আমাদের জীবনকে কিছুটা গভীর করে তোলে।

শীতকাল একদিন শেষ হয়। কুয়াশার পর্দা সরে গিয়ে প্রকৃতি আবার রঙিন হয়ে ওঠে। কিন্তু শীতের সেই দিনের অভিজ্ঞতা, সেই ছোট ছোট মুহূর্তগুলো মনের ভেতর গেঁথে থাকে।

আজ যখন বড় হয়ে ব্যস্ত শহুরে জীবনে শীতের উপস্থিতি খুব কম অনুভব করি, তখনও সেই গ্রামীণ শীতের স্মৃতিগুলো আমাকে একধরনের সুখ এনে দেয়। শীত মানে শুধু ঠাণ্ডা নয়, শীত মানে হলো একসাথে কাটানো সময়, প্রকৃতির সান্নিধ্য আর জীবনের ছোট ছোট আনন্দের গল্প।

শীতকাল আমাদের শেখায় কষ্টের মধ্যেও কীভাবে উষ্ণতা খুঁজে নিতে হয়। আমার কাছে শীতকাল শুধু একটি ঋতু নয় বরং জীবনের এক মায়াবী অধ্যায়।

লেখক: গল্পকার, সিরাজগঞ্জ

একটি বিকাল ও রিকশাওয়ালা মামা

-আহমেদ আরসলান

দিন পাঁচেক আগের কথা। ইট-পাথরের এই শহর থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে যেতে বাসা থেকে বের হয়েছি। গলির মুখ থেকেই একটি রিকশা ভাড়া করলাম। মামাকে বললাম, "আপনাকে দু'শ টাকা দেবো, সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনার যেদিকে ইচ্ছা আমাকে নিয়ে চলেন।"

মামা রাজি হলেন। অজানা এক গন্তব্যের দিকে ছুটে চলল রিকশা। গন্তব্যহীন রিকশা ভ্রমণ, এটা আমার বহুদিনের পুরোনো শখ।

রিকশায় বসেই ফোন সাইলেন্ট করে রাখলাম। এই সময়টুকু একান্তই আমার, কেউ যেন বিরক্ত না করে। মামা ধীরে ধীরে সুরমা নদীর তীর ধরে এগিয়ে চললেন। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এই যে রিকশাওয়ালা মানুষটি কত কষ্টে না তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন। আমার নিছক একটি শখ পূরণ করতে গিয়ে তিনি আসলে লড়ছেন পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য, তাদের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য।

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম,

মামা, আপনার পরিবারে কে কে আছেন?

মামা সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না। একটু পরে লক্ষ্য করলাম, তিনি চোখ মুছবার চেষ্টা করছেন। আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি। কিছুক্ষণ পর করুণ কণ্ঠে তিনি নিজেই বলতে শুরু করলেন তাঁর জীবনের গল্প।

মামার সংসারে এক ছেলে, এক মেয়ে আর স্ত্রী। বহু কষ্টে নিজে রিকশা চালিয়ে আর স্ত্রী মানুষের বাসায় কাজ করে ছেলেকে পড়াশোনা করিয়েছেন। স্বপ্ন ছিল, ছেলে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে, সরকারি চাকরি করবে। একদিন তিনি গর্ব করে বলবেন, রিকশা চালিয়ে ছেলেকে বড় করেছেন, বড় মানুষ বানিয়েছেন।

স্বপ্নের অর্ধেক পূরণ হয়েছিল। ছেলে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে, বিসিএস ক্যাডারও হয়েছে। কিন্তু মানুষ হয়নি।

রিকশাওয়ালা মামা তাঁর সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন, শিক্ষিত করতে পেরেছেন, সুশিক্ষিত করতে পারেননি।

এটা অবশ্য মামার দোষ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ছেলেটি বাবা-মায়ের কষ্ট বুঝত। কিন্তু বিসিএস ক্যাডার হওয়ার পর, চার বছরের সম্পর্কের প্রিয় মানুষটিকে বিয়ে করার পর থেকেই যেন তার ভেতরে এক নিষ্ঠুর সত্তা জন্ম নিল। ধীরে ধীরে বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হতে থাকল।

কথা ছিল, বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দেখাশোনা করবে। তিনি একটু বিশ্রাম নেবেন। কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি। সত্তরের কোঠায় এসেও তাঁকে রিকশা চালাতে হয়। মেয়েটিও এখন যুবতী, তাকে বিয়ে দিতে হবে। নিজে অসুস্থ, নিয়মিত ওষুধ লাগে। স্ত্রীও আগের মতো কাজ করতে পারেন না। চারদিক থেকে দুশ্চিন্তা এসে চেপে বসেছে।

মামা কথা বলতে বলতে বারবার চোখ মুছছিলেন। ঠিক তখনই কানে ভেসে এলো মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসা সুমধুর আজানের ধ্বনি। আমরা একসঙ্গে নামাজ আদায় করলাম।

এরপর আবার ফিরে এলাম চিরচেনা সেই ইট-পাথরের জীবনে, কিন্তু বুকের ভেতরটা আর আগের মতো রইল না।

লেখক: শিক্ষার্থী, সিলেট

লেখা আহবান

অনলাইন সাময়িকী সাহিত্য বৈচিত্ত্যের প্রকাশিতব্য **"বসন্ত সংখ্যায়"** লেখা আহবান করা যাচ্ছে। উক্ত সংখ্যায় আপনার লিখিত ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক আগামী ১৫ মার্চ ২০২৬ তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

লেখা পাঠান:
masikbaicittya20@gmail.com
+8801755867468 (Whatsapp)
সাহিত্য বৈচিত্র্য fb/Messenger

শ্যাওলা ধরা উঠোন ও স্মৃতির কঙ্কাল

গল্প

-সাজমুন নাহার

আশ্বিনের শেষবেলা। আকাশটা মরা মানুষের চোখের মতো ফ্যাকাশে হয়ে আছে। গফুর মিয়া তার জীর্ণ দাওয়ায় বসে ঝাপসা চোখে সামনের উঠোনটার দিকে চেয়ে থাকেন। এই উঠোনটা একসময় কথা বলত। নবান্নের দিনে যখন মা আর চাচিরা মিলে উঠোনময় আলপনা দিত, তখন মনে হতো মাটি যেন হাসছে। রোদে মেলা সোনালি ধানের ওপর চড়াই পাখিদের নাচন আর জাঁতাকলের সেই অবিরাম ঘর্ঘর শব্দ ছিল এই বাড়ির প্রাণস্পন্দন।

অথচ আজ উঠোনটার বুক চিরে একটা উঁচু ইটের দেয়াল উঠে গেছে। যেন একটা জীবন্ত মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মাঝখান দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে। ওপাশে গফুরের ছোট ভাই হাসেমের অংশ। এপাশে গফুরের। মাঝখানের সেই দেয়ালটা এখন নোনা ধরে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, যার গায়ে জেদি শ্যাওলার আস্তরণ। ভাইয়ে ভাইয়ে কথা বন্ধ আজ তিন বছর। শেষবার কথা হয়েছিল মোহরের আব্বার সালিশি বৈঠকে–জমির ইঞ্চি মেপে ভাগাভাগির দিন। তারপর থেকে উঠোনের রোদটুকুও যেন দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

গত রাতে বৃষ্টি হয়েছে। অসময়ের ঝমঝমে বৃষ্টি। টিনের চালে সেই বৃষ্টির শব্দ গফুর মিয়ার কাছে কোনো সুর মনে হয় না; মনে হয় অভাবের কর্কশ নখ দিয়ে কেউ তার বুকের পাজরগুলো আঁচড়াচ্ছে। চালের ফুটো দিয়ে জল পড়ে ঘরের কোণে কাদা জমেছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি শুনেছেন সেই জল পড়ার শব্দ আর পাশের ঘরে তার বৃদ্ধা স্ত্রী কুলসুমের খসখসে কাশির আওয়াজ।

গফুর মিয়া ডাকলেন, ''শুনছো? একটু পানি খাবো।''

কুলসুমের কোনো উত্তর নেই। কেবল গোঙানির মতো একটা শব্দ ভেসে এলো। গফুর মিয়া জানেন, কুলসুমের শরীরটা আর চলছে না। অথচ তার নিজেরও শরীর অবশ। এই যে এত বড় একটা গ্রাম, এত মানুষ–অথচ এই এক চিমটি পানির জন্য তাকে আজ হাহাকার করতে হচ্ছে।

গ্রামের মেঠোপথটা এখন পিচঢালা হয়েছে। সরকার বাহাদুর রাস্তা করে দিয়েছেন, মোড়ে মোড়ে বিজলি বাতি জ্বলে। কিন্তু সেই আলোর নিচে মানুষের মুখগুলো বড্ড অন্ধকার। গফুর মিয়ার নাতি সোহেল শহর থেকে ফিরেছে মাসখানেক আগে। হাতে একটা দামি স্মার্টফোন। ছেলেটা সারাদিন সেই ফোনের মায়াবী আলোয় মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। তার চোখের মণি দুটো যেন ওই চারকোণা কাঁচের ভেতরেই আটকে গেছে।

দাওয়ায় বসে গফুর দেখলেন, সোহেল উঠোন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।
"ওরে সোহেল, একটু শোন না বাপ। তোর দাদিটা কেমন করছে, একটু দেখে আসবি?"

সোহেল একবারও চোখ তুলল না। ফোনের স্ক্রিনে কার যেন ভিডিও চলছে, সেখান থেকে ভেসে আসছে উগ্র এক বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। সে বিড়বিড় করে বলল, "উফ দাদা, জ্বালিও না তো! ইম্পর্টেন্ট কাজ করছি।"

সোহেল চলে গেল। গফুর মিয়া তাকিয়ে থাকলেন তার চলে যাওয়ার পথের দিকে। আগে এই গাঁয়ে আগন্তুক এলেও দাওয়ায় বসিয়ে এক ঘটি জল আর এক টুকরো গুড় দেওয়া হতো। মানুষের হাতের ছোঁয়ায় এক অদ্ভুত মমতা ছিল। আর আজ নিজের রক্ত, নিজের নাতি–একই ছাদের নিচে থেকেও যেন সাত সমুদ্র দূরে বাস করছে।

বিকেলের ম্লান আলোয় গ্রামের চায়ের দোকানে এখন ভিড় বাড়ে। গফুর মিয়া একসময় সেখানে গিয়ে বসতেন। তখন মজিদ মাস্টার কিসসা শোনাতেন– সোহরাব-রুস্তমের গল্প, হাতেম তাই-এর দয়া। এখন সেখানে গেলে কানে আসে অন্য সুর। পরনিন্দার ধারালো উৎসব চলে সেখানে। কার মেয়ে কার সাথে পালাল, কার ছেলে জেল খাটল–এইসব চর্চায় একেকজন মানুষের জিহ্বা যেন ধারালো কাঁচি হয়ে ওঠে। মানুষের মনগুলো আজ সরু গলির মতো হয়ে গেছে, যেখানে কেবল নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু ঢোকে না।

গফুর মিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের কোণে রাখা পুরনো হুঁকোটা হাতে নিলেন। কল্কেতে আগুন নেই, শুধু ছাই। উঠোনের সেই প্রাচীরটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো–আমরা আসলে একটা দীর্ঘ মিছিলে শামিল হয়েছি। আমরা আধুনিক হয়েছি, আমাদের হাতে জাদুকরী আলো এসেছে, রাস্তা পাকা হয়েছে; কিন্তু আমরা একেকজন হয়ে গেছি এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। সামাজিকতার চটকদার মুখোশ পরে আমরা আসলে প্রত্যেকেই ভীষণ একা।
হঠাৎ পাশের ঘর থেকে কুলসুমের একটা করুণ গোঙানি আর থালা পড়ার শব্দ ভেসে এলো। গফুর মিয়া কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার জীর্ণ হাঁটু দুটো আজ বড্ড বেশি ভারী হয়ে গেছে। তিনি দেয়ালে হাত দিলেন। দেয়ালটা ঠান্ডা, প্রাণহীন। ঠিক মানুষের মনের মতো।
কুলসুমের ঘরের সেই থালা পড়ার শব্দটা গফুর মিয়ার কানে সীসার মতো বিঁধল। তিনি অনেক কষ্টে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে দুপা এগোতেই দেখলেন, ওপাশে হাসেমের ঘরের বারান্দায় হাসেমের বড় ছেলে মন্টু বসে আয়েশ করে সিগারেট ফুঁকছে। তাদের বাড়ির ওপাশ থেকে ভাজা মাছের সুবাস ভেসে আসছে। গফুর মিয়ার খুব ইচ্ছে হলো চিৎকার করে মন্টুকে ডাকতে, বলতে–"বাপ, তোর চাচিটা বোধ হয়

শেষ হয়ে যাচ্ছে, একবার দেখবি?" কিন্তু তিন বছর আগে সালিশি বৈঠকে হাসেমের ছোঁড়া সেই অপমানজনক শব্দগুলো কাঁচের টুকরোর মতো তার গলায় আটকে রইল।

আভিজাত্য আর জেদের এক অদ্ভুত লড়াইয়ে আজ জীবনের চেয়ে দেয়ালটা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গফুর মিয়া ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলেন, কুলসুম মেঝের ওপর পড়ে আছেন। পিপাসায় হয়তো পানি খেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কুঁজোর কাছে পৌঁছানোর আগেই ভারসাম্য হারিয়েছেন। ঝাপসা আলোয় কুলসুমের ফ্যাকাশে মুখটা দেখে গফুরের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। এই সেই কুলসুম, যে বিয়ের পর এই বাড়িতে পা দিয়ে উঠোনটাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বানিয়ে ফেলেছিল। যার হাতের পিঠার ঘ্রাণে পাড়া মাতোয়ারা হতো। আজ সেই মানুষটা একটা এনামেলের গ্লাসও ধরে রাখার শক্তি হারিয়েছে।

গফুর মিয়া মেঝেতে বসে পড়লেন। কাঁপা কাঁপা হাতে কুলসুমের মাথায় হাত রাখলেন।

"ও কুলসুম, কথা কও। আমি আসছি তো।"

কুলসুম চোখ মেলে তাকালেন। সেই চোখের মণি দুটো যেন বহু দূর থেকে ফিরে এল। ক্ষীণ স্বরে বললেন, ''পানি... একটু পানি দাও।"

গফুর মিয়ার মনে পড়ল, ঘরের কলসিতে পানি নেই। সোহেলকে সকালে বলা হয়েছিল, সে কানেই নেয়নি। এই পড়ন্ত বিকেলে এক ঘটি পানির জন্য গফুর মিয়া অসহায়ভাবে নিজের উঠোনের দিকে চাইলেন। বাইরে তখন মাগরিবের আজান পড়ছে। গ্রামের মসজিদটা এখন টাইলস বসানো ঝকঝকে তকতকে। লাউডস্পিকারে মোয়াজ্জিনের গলার আওয়াজ পুরো গ্রাম ছাপিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই শব্দের পেছনে মানুষের হাহাকার ঢাকা পড়ে যায়।

গফুর মিয়া টলতে টলতে উঠোনে বেরিয়ে এলেন। ওপাশে হাসেমের টিউবওয়েলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কেউ একজন পানি তুলছে। গফুর দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এই দেয়ালটাই এখন তার জীবনের সবচেয়ে বড় বাধা। তিনি মৃদু স্বরে ডাকলেন, "হাসেম? ও হাসেম?"

টিউবওয়েলের শব্দ থেমে গেল। কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। হাসেম কি শুনতে পেয়েছে? নাকি আধুনিক জীবনের যান্ত্রিকতা তাকেও বধির করে দিয়েছে?

একটু পর হাসেমের গলার স্বর শোনা গেল, তবে গফুরের উদ্দেশ্যে নয়। হাসেম তার স্ত্রীকে বলছে, "দেখো তো, ওপাশ থেকে কে যেন ভিখারির মতো ফিসফিস করছে। গেটটা ভালো করে আটকে দাও, আজকাল চোর-ছ্যাঁচড়ের বড় উৎপাত।"

গফুর মিয়ার দুচোখ বেয়ে নোনা পানি নেমে এল। এই সেই ছোট ভাই, যাকে তিনি বাবার মৃত্যুর পর নিজের পিঠে চড়িয়ে বড় করেছিলেন। যার পড়াশোনার খরচ জোগাতে নিজের হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছেন।

আজ সে তাকে 'চোর-ছ্যাঁচড়' ভাবছে।

রাত্রি গভীর হয়। সোহেল শহর থেকে আসা বন্ধুদের সাথে বাড়ির পেছনে আড্ডা দিচ্ছে। সেখান থেকে ভেসে আসছে চড়া মিউজিক আর উচ্চস্বরে হাসির শব্দ। তাদের কারো জানবার অবকাশ নেই যে, এই জীর্ণ দেয়ালের ভেতরে এক বৃদ্ধ দম্পতি জীবনের শেষ প্রদীপটুকু বাঁচিয়ে রাখার লড়াই করছে।

সোহেল একবার ঘরে উঁকি দিয়ে বলল, "দাদা, রাতে খাব না। বাইরে থেকে খেয়ে আসছি। দাদিকে ওষধু দিয়ে দিও।"

গফুর মিয়া বলতে চেয়েছিলেন—ওরে বাপ, ওষুধ কেনার টাকা তো শেষ হয়ে গেছে তিন দিন আগে। তোর দাদিকে একটু পানি এনে দে। কিন্তু সোহেল ততক্ষণে বাইকের স্টার্ট দিয়ে উধাও। বাইকের ধোঁয়া আর আলোর রেখা অন্ধকার উঠোনটাকে এক মুহূর্তের জন্য চিরে দিয়ে গেল।

গফুর মিয়া কুলসুমের পাশে শুয়ে পড়লেন। তার মনে হলো, এই যে আধুনিক পৃথিবী, যেখানে মানুষের হাতে হাত রাখা যায় না কিন্তু ফোনের স্ক্রিনে হাজার হাজার 'বন্ধু' থাকে, এই পৃথিবীটা আসলে এক বিরাট মরুভূমি। এখানে ঝকঝকে রাস্তা আছে কিন্তু গন্তব্য নেই; বিজলি বাতি আছে কিন্তু মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার মতো আলো নেই।

শেষ রাতে বৃষ্টির তোড় বাড়ল। শ্যাওলা ধরা সেই দেয়ালের এক কোণ দিয়ে নোনা ধরা ইটগুলো খসে পড়তে শুরু করেছে। গফুর মিয়া জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন—মাঝখানের দেয়ালটা ধসে পড়েছে। হাসেম তার সেই ছোটবেলার মতো দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, "বড় ভাই, ভয় নাই, আমি আছি তো।"

স্বপ্নটা ভাঙল কুলসুমের হাতের একটা শীতল ছোঁয়ায়। কুলসুমের হাতটা এখন বরফের মতো ঠান্ডা। গফুর মিয়া চিৎকার করতে চাইলেন, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শ্যাওলা ধরা দেয়ালের ওপাশে পৌঁছাল না। ওপাশে তখন হাসেমের ঘরে এসি চলছে, বাইরের কোনো আওয়াজ সেখানে ঢোকার অনুমতি নেই।

সকালের আলো যখন ফুটল, তখন আকাশটা আর ফ্যাকাশে ছিল না। রোদ ঝলমলে আশ্বিনের সকাল। কিন্তু সেই রোদেলা উঠোনের মাঝখানের দেয়ালটা আজ আরও বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ, একপাশে তখন কান্নার রোল উঠেছে, আর অন্যপাশে তখন আধুনিক জীবনের জাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া মানুষেরা ব্যস্ত তাদের সকালের রুটিন নিয়ে। স্মৃতির কঙ্কালগুলো আজ সেই উঠোনের শ্যাওলার নিচেই চাপা পড়ে রইল।

কুলসুমের নিথর দেহটা যখন উঠোনের মাঝখানে রাখা হলো, তখনো আসমানের সেই নীল রঙটা বদলায়নি। অথচ গফুর মিয়ার পৃথিবীটা ওলটপালট হয়ে গেছে। গ্রামের দু-চারজন লোক জড়ো হয়েছে, কিন্তু তাদের চোখে সমবেদনার চেয়ে কৌতূহল বেশি। তারা কুলসুমের মৃত্যুর চেয়ে বেশি দেখছে গফুর আর

হাসেমের মাঝখানের সেই নোনা ধরা প্রাচীরটাকে। এই দেয়ালটা যেন আজ শুধু ইটের স্তূপ নয়, মানুষের বিবেকের ওপর এক বিশাল পাথর হয়ে চেপে বসে আছে।

গফুর মিয়া নির্বাক হয়ে দাওয়ায় বসে আছেন। তার চোখের জল শুকিয়ে চামড়ায় সাদাটে দাগ পড়ে গেছে। তিনি একবার ওপাশের দেয়ালের দিকে তাকান, আবার কুলসুমের সাদা কাফনের দিকে। কুলসুম চলে যাওয়ার সময় এক ফোঁটা পানি চেয়েছিল, গফুর তা দিতে পারেননি। এই অপরাধবোধ তার বুকের ভেতর একটা বিষাক্ত সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

হাসেমের বাড়ির সদর দরজা আজ বন্ধ। তবে জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে মন্টুর কিংবা হাসেমের স্ত্রীর ছায়া দেখা যাচ্ছে। গ্রামের মাতব্বর মোহর আলীর আব্বা এসে দাওয়ায় বসলেন। লম্বা একটা শ্বাস ফেলে বললেন, "গফুর, মিছে শোক করে লাভ নেই। মানুষ তো একদিন যাবেই। এখন দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু মুশকিল হলো-পুরানো গোরস্তানে তো জায়গা নেই। হাসেমের ভাগের ওই বাঁশঝাড়ের পাশে যে জমিটুকু আছে, সেখানে কবর দিলে সুবিধা হতো।"

গফুর মিয়া মূর্তির মতো বসে রইলেন। কোনো উত্তর দিলেন না। মোহর আলীর আব্বা দেয়ালের ওপাশে গলা চড়িয়ে ডাকলেন, "হাসেম! ও হাসেম! মিঞা ভাই বের হও। ঘরের পাশে জানাজা, আর তুমি ভেতরে খিল দিয়ে আছো? রক্ত কি একদম জল হয়ে গেল?"

অনেকক্ষণ পর হাসেম বের হয়ে এল। পরনে ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি, চোখে দামি চশমা। সে সীমানা প্রাচীরের ওপাশে দাঁড়িয়ে শীতল গলায় বলল, "চাচা, শোনেন। আমার জমিতে আমি কবর দিতে দেব না। ওই জমিতে আমি আগামী মাসে পোল্ট্রি ফার্ম করার জন্য কন্ট্রাক্ট করেছি। ওখানে কবর দিলে ব্যবসার ক্ষতি হবে। আর তাছাড়া, তিন বছর আগে যখন সব ভাগ হয়েছে, তখন তো ওপাশের গোরস্তানের অংশ ওরাই নিয়েছে। এখন আমার কাছে কেন?"

হাসেমের কথাগুলো শুনে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল। গফুর মিয়া হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। সেই হাসির শব্দে শ্মশানের নিস্তব্ধতা ছিল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হাসেম রে, তুই ঠিকই বলেছিস। মাটির ওপরের দেয়ালটা তো আমরা আগেই তুলেছি, এখন মাটির নিচের দেয়ালটাও জরুরি। চিন্তা করিস না বাপ, তোর ব্যবসার ক্ষতি আমি হতে দেব না।"

বিকেল গড়াল। সোহেল তখনো শহরের বন্ধুদের সাথে ফোনে কথা বলছে। দাদির মৃত্যু তাকে খুব একটা বিচলিত করেছে বলে মনে হলো না। সে শুধু একবার এসে দেখে গেছে আর বাবার কাছে টাকা চেয়েছে-কাফনের কাপড়ের জন্য নয়, নিজের বাইকের তেলের জন্য। তার কাছে দাদির মৃত্যু মানে একটা 'বোরিং' পরিবেশ, যেখানে ইন্টারনেটের স্পিড একটু কম পাওয়া যাচ্ছে।

গফুর মিয়া লক্ষ্য করলেন, গ্রামের নওজোয়ানরা জানাজার চেয়ে সেলফি তুলতেই বেশি ব্যস্ত। "লাশ নিয়ে শেষ যাত্রা"–এই ক্যাপশন দিয়ে কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিচ্ছে। যে মজিদ মাস্টার একসময় নীতি-নৈতিকতার গল্প শোনাতেন, তিনিও এখন রাজনীতির হিসাব মেলাচ্ছেন। কার জানাজায় গেলে আগামী নির্বাচনে ভোট পাওয়া যাবে, সেই অংকে তিনি বিভোর।

মৃত কুলসুমের পাশে বসে গফুর মিয়া ফিসফিস করে বললেন, "কুলসুম, দেখলি তো? আমরা মানুষ চিনি নাই। আমরা ভেবেছিলাম ইট-পাথর দিয়ে ঘর বানাইলেই সংসার হয়। অথচ আমরা আসলে একেকটা খাঁচায় বন্দি জানোয়ার হয়ে গেছি।"

সন্ধ্যা নামার ঠিক আগে কুলসুমকে নিয়ে যাওয়া হলো গ্রামের সাধারণ কবরস্থানে। হাসেম তার ঘরের এসি ছেড়ে দিয়ে টিভির ভলিউম বাড়িয়ে দিয়েছে, যাতে বাইরের কান্নার শব্দ ভেতরে না ঢোকে। কিন্তু প্রকৃতির বিচার বড় বিচিত্র। কুলসুমের দাফন শেষ করে গফুর মিয়া যখন একা ফিরে এলেন, তখন দেখলেন উঠোনের সেই শ্যাওলা ধরা দেয়ালটার গায়ে বড় একটা ফাটল ধরেছে। বৃষ্টির পানি আর নোনা ধরা ইটের ভারে দেয়ালটা এখন নড়বড়ে।

গফুর মিয়া তার অন্ধকার ঘরে ঢুকলেন। কুলসুমের সেই খালি বিছানাটা যেন তাকে গিলতে আসছে। পাশের ঘর থেকে সোহেলের হাসির শব্দ ভেসে আসছে। সে কার সাথে যেন ভিডিও কলে কথা বলছে আর বলছে, "হ্যাঁ জান, দাদি মারা গেছে তো কী হয়েছে? আমি তো কালকেই আসছি শহরে। এখানে থাকা অসহ্য!"

গফুর মিয়া জানালার শিক ধরে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার মনে হলো, এই ফ্যাকাশে জ্যোৎস্নায় পুরো গ্রামটা যেন একটা বড় কবরস্থান। জ্যান্ত মানুষগুলো কবরের ভেতরে না ঢুকে দামি দামি দালানের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তফাৎ শুধু এটুকুই।

রাত যখন গভীর হলো, গফুর মিয়া শুনতে পেলেন একটা অদ্ভুত শব্দ। ঝুরঝুর করে মাটি পড়ার শব্দ। তিনি হারিকেন নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, মাঝখানের সেই দেয়ালটা মাঝখান থেকে ধসে পড়েছে। হাসেমের সাজানো বাগান আর গফুরের জীর্ণ উঠোন এখন একাকার। কিন্তু এই একাকার হওয়াতে কোনো আনন্দ নেই। কারণ মাঝখানে পড়ে আছে ভাঙা ইটের কঙ্কাল।

হাসেমও ঘর থেকে বেরিয়ে এল। টর্চের আলোয় ভাইয়ের সাথে চোখাচোখি হলো তার। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। যে দেয়ালটা ইট দিয়ে গড়া ছিল, সেটা ভেঙে পড়লেও মনের ভেতরে অহংকারের যে অদৃশ্য প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে, তা ভাঙার সাধ্য কারোর নেই।

গফুর মিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাঙা ইটের ওপর গিয়ে বসলেন। শ্যাওলার সেই পিচ্ছিল গন্ধটা এখন আরও তীব্র। তিনি বুঝতে পারলেন, এই দেয়াল ভাঙলেও তারা আর

কখনো এক হতে পারবেন না। কারণ তারা আধুনিক সভ্যতার সেই স্তরে পৌঁছে গেছেন, যেখানে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করতে শেখে, কিন্তু ক্ষমা করতে ভুলে যায়।

ধসে পড়া দেয়ালের ইটগুলো যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। বৃষ্টির জলে ধোয়া মাটির গন্ধে একসময় এই উঠোনে সোঁদা গন্ধ আসত, আজ সেখানে কেবল নোনা ধরা ইটের কটূ গন্ধ। গফুর মিয়া সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে আছেন। মাঝখানের প্রাচীরটা নেই, অথচ তার মনে হচ্ছে হাসেম আর তার মাঝে এখন এক প্রশান্ত মহাসাগর সমান দূরত্ব।

হাসেম টর্চের আলোটা গফুরের মুখের ওপর ফেলে কর্কশ গলায় বলল, "সকালেই মিস্ত্রি ডাকতে হবে। দেয়ালটা এবার আরও শক্ত করে গাঁথতে হবে, আর ওপরে কাঁটাতারের বেড়া দেব। আপনার দিকের শ্যাওলা এসে আমার ইটের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।"

গফুর মিয়া কোনো উত্তর দিলেন না। তার শূন্য দৃষ্টি আকাশের দিকে। আজ আকাশে কোনো মেঘ নেই, তার বদলে লক্ষ কোটি নক্ষত্র জ্বলছে। ওরাও কি মানুষের এই ক্ষুদ্রতা দেখে মিটিমিটি হাসছে?

পরদিন ভোরেই গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়াল। হাসেম সত্যি সত্যিই শহর থেকে রাজমিস্ত্রি আনিয়েছে। এবার আর ইটের দেয়াল নয়, আরসিসি পিলার দিয়ে শক্ত করে সীমানা ঘেরা হবে। গফুর মিয়ার দাওয়ার ঠিক পাশ দিয়েই ড্রিল মেশিনের ঘর্ঘর শব্দ শুরু হলো। আধুনিক যন্ত্রপাতির সেই শব্দে কুলসুমের স্মৃতিগুলো যেন কুঁচকে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

সোহেল ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি। সে শহরে ফিরে যাচ্ছে। গফুর মিয়া দাওয়ায় বসে তাকে ডাকলেন, "শোন বাপ, তোর দাদির ৪০ দিনের দিন একটা মিলাদ দিতাম। আসবি না?"

সোহেল বিরক্তির সাথে ঘড়ি দেখল। "দাদা, এসব সেকেলে রিচুয়াল বাদ দাও তো। মিলাদ দিয়ে কী হবে? পরকালে তো ডেটা ট্রান্সফার হয় না। আমি টাকা পাঠিয়ে দেব, কাউকে দিয়ে করিয়ে নিও। আমার অফিসে প্রেজেন্টেশন আছে।"

সোহেল তার মোটরবাইকে স্টার্ট দিল। ধুলো উড়িয়ে সে যখন চলে গেল, গফুর মিয়ার মনে হলো তার শেষ সম্বলটুকুও সেই ধুলোর সাথে মিশে গেল। আমরা সন্তানদের মানুষ করি তাদের ডানা হওয়ার জন্য, কিন্তু সেই ডানার ঝাপটায় যে একসময় নিজেরা খড়কুটোর মতো উড়ে যাব, তা কি কেউ ভেবেছিল?

দুপুরের দিকে গফুর মিয়ার ঘরে মজিদ মাস্টার এলেন। তার হাতে একটা খবরের কাগজ। তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, "গফুর মিয়া, শুনছেন? আমাদের গ্রাম নাকি 'মডেল ভিলেজ' হচ্ছে। রাস্তার ওপাশে বড় শপিং মল হবে, আর এই যে আপনাদের উঠোন–সরকার এখান দিয়ে একটা বাইপাস রাস্তা নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। জমি অধিগ্রহণ হবে, অনেক টাকা পাবেন!"

গফুর মিয়া হাসলেন। এ হাসি বড় করুণ।

"টাকা দিয়ে কী করব মাস্টার? কুলসুম চলে গেছে, ভাই পর হয়ে গেছে, নাতিটা তো রোবট হয়ে ফিরল। এই টাকার ওপর কি আমি দেয়াল তুলে শান্তি পাব?"

মাস্টার বুঝলেন না। তিনি আধুনিক উন্নয়নের স্বপ্নে বিভোর। তিনি বোঝাতে লাগলেন কীভাবে স্মার্টফোনের অ্যাপ দিয়ে এখন গবাদি পশুর চিকিৎসা করা যায়। গফুর মিয়া শুধু ভাবলেন, মানুষের মনের চিকিৎসার কোনো অ্যাপ কি আজও তৈরি হয়েছে? যেখানে ঘৃণা ডিলিট করা যায় আর ক্ষমা ডাউনলোড করা যায়?

সপ্তাহখানেক পর। হাসেমের নতুন দেয়াল দাঁড়িয়ে গেছে। মসৃণ সিমেন্টের আস্তর, তার ওপর চকচকে রঙ। ওপাশে এসি চলার অবিরাম গুনগুন শব্দ। এপাশে গফুর মিয়া একা। তার শরীরটা গত দুদিনে খুব ভেঙে পড়েছে। আজ রাতে তার খুব পানি তৃষ্ণা পেল। কুঁজোর কাছে যেতে গিয়ে তিনি টাল সামলাতে পারলেন না। মেঝেতে পড়ে গিয়ে তার মনে হলো, আজ বোধহয় তারও ডাক এসেছে।

তিনি দেয়ালের ওপাশে হাসেমকে ডাকতে চাইলেন। কিন্তু আওয়াজ বের হলো না। তিনি হাত বাড়িয়ে দেয়ালটা ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন। নতুন রঙ করা দেয়ালটা বড় পিচ্ছিল, বড় অচেনা। একসময় এই ভিটেতে ভাইয়ে ভাইয়ে কুস্তি হতো, এই উঠোনে তারা এক থালায় ভাত খেত। আজ সেই স্মৃতিগুলো কঙ্কাল হয়ে হাসছে।

গফুর মিয়ার ঝাপসা চোখে ভেসে উঠল এক অদ্ভুত দৃশ্য। তিনি দেখলেন, মাঝখানের দেয়ালটা নেই। কুলসুম রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া ওঠা ভাতের থালা নিয়ে আসছে। হাসেম তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। আর মা উঠোনে ধান শুকোচ্ছেন।

পরদিন সকালে হাসেমের আয়েশি ঘুম ভাঙল মিস্ত্রিদের চিল্লামিল্লিতে। তারা গফুর মিয়ার ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে। হাসেম অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওপাশে গেল। দেখল, গফুর মিয়া মেঝের ওপর পড়ে আছেন। তার একটা হাত প্রসারিত হয়ে আছে হাসেমের সেই নতুন দেয়ালের দিকে। যেন মরার আগে তিনি শেষবারের মতো দেয়ালটা নয়, তার ভাইকে ছুঁতে চেয়েছিলেন।

হাসেমের বুকটা কি একটু কেঁপে উঠল? সম্ভবত না। সে কেবল বিরস মুখে বলল, "ঝামেলা বাড়ল। দাফনের খরচটা তো এখন আমাকেই টানতে হবে।"

গফুর মিয়ার লাশের পাশে তার পুরনো স্মার্টফোনটা পড়ে ছিল, যেটা সোহেল ফেলে গিয়েছিল। ফোনের স্ক্রিনটা জ্বলে উঠল একটা নোটিফিকেশনে। কোনো এক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ জানাচ্ছে–"You have 500 new friends to connect with!"

বাইরে তখন রোদেলা দুপুর। উঠোনের সেই শ্যাওলা ধরা অংশটুকু নতুন দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে গেছে।

আর সেই চকচকে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য–আমরা এখন অনেক উন্নত, অনেক শিক্ষিত, কিন্তু দিনশেষে আমরা প্রত্যেকেই একেকটা সৎকারহীন স্মৃতির কঙ্কাল বহন করে চলা নিঃসঙ্গ যাত্রী।

লেখক: কবি ও গল্পকার, দিনাজপুর

কবিতা

The weights of miles

-Jannatul ferdous holy

What could be worse or more
painful
Than this—
The one my heart and soul feel
closest to
Is the one farthest from me in
distance.

The arms I long for the most
Are the only ones I cannot reach.

I wish for a day when the distance
becomes so small
That even the air between us feels
suffocated
By our closeness.

Instead of waiting for updates on a
screen,
I will wait for footsteps
everyday—
For a reunion with the only soul
That feels like home.

This distance hurts terribly,
But maybe that is why our souls
met first—
And became one
Long before our eyes ever did.

Writer: Student, Sylhet

ছড়া ও কবিতা

শীতের স্নায়ু থেকে

-বাছিত ইবনে হাবীব

শীতের স্নায়ু থেকে বিষমাখা চাবুক এসে দাঁড়িয়ে দরজায়।
বের হতে চায় কেউ অচেতন মনে?
গ্রেফতার করো তাকে সদর্প শ্বাসে।

পাতাঝরা বনানীর ভাষা-'আমি তো হারিয়ে সব
আশা - ভালোবাসা।
অনিশ্চিত স্বাদ গন্ধের তেতো ঠিকানায়।'

বিবস্ত্র দেহগুলোর পুরো আয়তনে শীতের চমক
ধমক বেশ ঘন ভারী।
শীতের যৌবন তাই নয়, কাম্য নয়।

কাঁপতে কাঁপতে যারা মৃত্যুর কোলে,
শীতার্ত শোকগাঁথা তাদের জবানে।
জীবিত মানসলোকে মহৌষধ সম।

শীতের স্বরলিপি পাঠে নান্দনিক স্রোতে
তরতাজা সবজিগুলো চিরহরিৎ কবিতা
কারো কাছে শীত মানে বাসন্তী বিলাস।

শীতের সূর্য প্রচ্ছদ যখন তোমার চোখে
বাসন্তী বাসনাধ্বণি বাজে বুক থেকে বুকে।

লেখক: কবি, ও অধ্যাপক, সিলেট

শীত নেমেছে দেশে

-ফেরারী মুসাফির

শীত দেখেছি পাড়ার মোড়ে
শীত পেয়েছি হাটে
শীত এসেছে শহরতলী-
পথশিশু ফুটপাতে।

শীত পড়েছে গায়ের মাঠে
শীত নেমেছে ঘরে
শীত লেগেছে জুয়ান বুড়োর
আগুন পোহায় খড়ে।

শীত এসেছে শীত পড়েছে
শীত নেমেছে দেশে
শীতের প্রকোপ কুঁকড়ানো শোক
শীত ঝড়ছে কেশে।

লেখক: কবি ও শিক্ষক, সিলেট

নির্বাক

-এ. এস. এম কবির হোসাইন

এখন আর অবাক হই না!
মানুষরূপী অমানুষ দেখে।
তথাকথিত শিক্ষিত মুখোশধারী ভদ্রজন ;
অনেকেই শিক্ষার আলো নির্বাপিত করে অন্ধকারের যাত্রী।

এখন আর অবাক হই না!
ঘুনে ধরা সমাজের চিত্র দেখে।
সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির বীজ;
নৈতিকতা, মূল্যবোধ মুখে আওড়ানো বুলি।

এখন আর অবাক হই না!
স্পষ্টভাষী সৎ মানুষের একাকিত্ব দেখে।
সুবোধ জাগ্রত বিবেকবান মানুষের অবমাননায়,
সমাজের অবক্ষয় রুখতে চাওয়া ব্যক্তির নিঃসঙ্গতায়।

এখন আর অবাক হই না!
পবিত্র ভালোবাসাহীন মেকি প্রেম দেখে।
পুরুষতান্ত্রিকতার যাঁতাকলে পিষ্ট নারীর যাতনায়,
উন্মত্ত নির্লজ্জ নর-নারীর উচ্ছৃঙ্খলতায়।

এখন আর অবাক হই না!
আত্মোপলব্ধিহীন নির্লিপ্ত নির্বাক চিত্ত দেখে।
মানব সত্তার অনাকাঙ্ক্ষিত অপমৃত্যুয়,
নরপশুদের বাধাহীন অধিকার প্রতিষ্ঠায়!

লেখক: কবি ও শিক্ষক, ঢাকা

উদাস প্রহর

-প্রিয়সী মনি

শালিক পাখির ডাক শোনা যায়
নিঝুম দুপুর বেলা
স্মৃতির পাতায় চলছে আজও
তোমার মায়ার খেলা।
তোমার আমার হারিয়ে ফেলা
শৈশবের সেই ঘুড়ি
তোমায় ছাড়া একলা আমি
কেমনে চালাই তরি?
পথের ধারে দাঁড়িয়ে থেকে
পথপানে থাকো চেয়ে
কবে তুমি আসবে ফিরে
আমার গাঁয়ের মেয়ে?

লেখক: বিশিষ্ট কবি, রংপুর

শীতের সময়

-ওয়াহিদ ওয়াসেক

বের করেছি লেপ, কম্বল-
জ্যাকেট, সোয়েটার;
কালচে রঙের দুইটা মোজা
চকচকে মাফলার!

বের করেছি খালার দেওয়া
মেরুন কালার শাল-
মামার দেওয়া উলের টুপি
বের করেছি কাল!

বের করেছি শোকেস থেকে-
মেরিল, লোশন, জেল;
পরশু এনে ভাইয়া দিছে
হিমকবরি তেল!

শীতের সময় আর যা লাগে
কিনব দারাজ থেকে-
আমার মতো এমন করে
শীত কাটাবে কে কে?

লেখক: বিশিষ্ট ছড়াকার, সিলেট

ব্যাচেলর রুবি দে

-মাহমুদা জিয়াসমিন

শোনো, শোনো রুবি দে
শীতকালে আমাদের-
বিবাহিত মেয়েদের জানো কী কী সুবিধে?

মনমতো মেকআপ করা যায় মুখটায়
ঘাম নেই, সাজা যায় যে-কোনোই লুকটায়!

ঘোরাঘুরি করা যায় প্রিয় সব জায়গায়
নাইওর নিয়ে যেতে মায় ডাকে আয় গাঁয়!

হিমজলে জামাইকে যায় খুব ক্ষেপানো-
কম্বল মুড়ি দিয়ে ফোন যায় টেপানো!

উঠি, উঠি... বলে বলে... উঠি, ঠিক আটটায়;
উঠে দেখি- আদরের বর সাব
চুপচাপ চলে গেছে অফিস বা হাটটায়!

শীতকালে পিঠাপুলি খাবা যায় বানিয়ে-
কতকিছু কেনা যায় বর দেয় আনিয়ে!

নেই কোনো অসুবিধে, আছে সব সুবিধে-
এইবার বিয়ে করো ব্যাচেলর রুবি দে!

লেখক: শিক্ষার্থী, স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজ, সিলেট

বীর হাদি ঠিক আসবে আবার

-এম এইচ ইউ রায়হান

দিক না যতই ফ্যাসিস্টের দল নতুন ইস্যু তুলে,
তাই বলে তো হাদিকে আমরা যাবো না কভু ভুলে।
ভুলতে পারি না হাদির চেহারা, দুই নয়নে ভাসে!
হাদির শোকে হয় হৃদয় কাতর, আঁখিতে অশ্রু আসে।

প্রয়োজনে ফের নামবো মাঠে, খুলতে ন্যায়ের দ্বার,
হাদির বদলা নিতে আমরা এখনো আছি সোচ্চার।
লক্ষ হাদিরা জেগে উঠেছে বাংলার ঘরে ঘরে,
হাদি আছে আর রবে চিরদিন আমাদের অন্তরে।

এক হাদিকে মারলে হাদিদের যায় কি কভু কমানো?
তিনশো তেরোর জাত হাদিরা, যায় না তাদের দমানো।
হাদিরা ন্যায়ের ঘূর্ণিঝড় আর ওমরের হুঙ্কার,
হাদিরা খালিদের দীপ্ত চেতনা, আলীর জুলফিকার।

হাদিরা আছে, থাকবেই-হাদিরা, হাদিদের হবে না ক্ষয়,
হাদিরাই হলো বীর, সাহসী, যুদ্ধে নির্ভয়।
হাদিরা হলো বজ্রাগ্নি, অসুরের করে ভস্ম,
হাদিরা আবাদি বাংলার জমিনে ফলাবে নতুন শস্য।
শুন ভারতের ভাড়াটে কুকুর, আঘাত হানবো তোদের ঘাঁটিতে,
হাদি হত্যার বিচার হতেই হবে এই বাংলার মাটিতে।
আস্তানা তোদের করবো ধ্বংস, চতুর্দিকে ঘিরে,
বীর হাদি ঠিক আসবে আবার, আবাবিল হয়ে ফিরে।

লেখক: বিশিষ্ট কবি
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী

কুয়াশার চাঁদর

-তালহা

কুয়াশার চাঁদর মেখে
ভোর আসে ধীরে,
নীরব শহর ঘুমোয় স্বপ্নের নীড়ে।

আলো-আঁধারের খেলায় হারায় পথ,
হৃদয়ের কোণে জমে অজানা রথ।

শীতল হাওয়ায় কাঁপে পুরনো স্মৃতি,
চোখের পাতায় ঝরে না বলা প্রীতি।
চাঁদর মোড়া সময় থেমে এক ক্ষণে,
আমি আর তুমি মিলি কুয়াশারবনে।

লেখক: বিশিষ্ট কবি

কোথাও হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে

-স্নেহাশীষ বড়ুয়া

কোথাও হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে
একাকী, নীরবে
শুধু নিজেকে সঙ্গে নিয়ে,
কোন নির্জন দ্বীপে-
বা পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়ায়
যেখানে আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মানুষ থাকবে না,
সেখানে নিজের সাথে আড্ডা দিবো
নিজের সাথে মন খুলে গল্প করবো
নিজেকে ভালোবাসবো
নিজেকে ভালো রাখবো,
স্বার্থের পৃথিবীর প্রতি বিতৃষ্ণা ধরে গেছে
রক্তের সম্পর্কগুলো কেমন যেন ঘোলাটে
আত্মার সম্পর্কগুলো মুখোশে আবৃত
জীবনটা পুরোনো বইয়ের মতো মলাটে
জনমানবের এই মেকি সংসার ভালো লাগছে না,
দূরে, আরো দূরে, নির্জন কোন সূদুরে
হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে
জাগতিক সব ভাবনা ছুঁড়ে ফেলে
পৃথিবীর কলুষতা পায়ে দলে
একাকী নীরবে নিঃশব্দে-
কোথাও হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে,
পৃথিবীকে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে
তুমি থাকো তোমার কলুষতা নিয়ে
আমাকে আমার মতো থাকতে দাও
আমাকে নিজের মতো বাঁচতে দাও-
কোন এক সাগর তীরে
বা কোন এক পাহাড়ি জুমঘরে
নয়তো ছোট্ট কোন এক শান্তির নীড়ে...

লেখক: বিশিষ্ট কবি, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম

ফুরানো রাত

-সাবেকুন নাহার

শীতের রাত দীর্ঘ হয়, দীর্ঘতর অপেক্ষায়
বিষণ্ন হৃদয় গোনে সময়
তুমি আসবে কি
তবে আজ কোথায়?

কিছু না বলে চলে গেলে
রেখে গেলে নিরব ক্ষয়
ব্যথাগুলো শব্দ খোঁজে
পায় শুধু শীতল ভয়।

পুরনো স্মৃতি জ্বলে ওঠে
মায়ার ধোঁয়াশায় ঢাকা
ঘুম পালিয়ে যায় চোখ থেকে
রাত হয় আরও একা।

এই অপেক্ষা, এই শীত
সবই বুঝি একাকার
ফুরোয় না রাত
ফুরোয় না তোমার রেখে যাওয়া ভার..!

লেখক: বিশিষ্ট কবি, বান্দরবান

পৌষের হাওয়া

-রং ছাড়া তুলি(কা)

পৌষের কনকনে শীতে কেঁপে ওঠে ভোরের বাতাস,
কুয়াশার ঘন চাদরে ঢাকা পড়ে নীল আকাশ।
সূর্য যখন লাজুক হেসে উঁকি দেয় ধীরে,
শিশির কণারা ব্যস্ত তখন ফিরে যেতে নীড়ে।
শ্বাসে জমে শীতলতা, হাত খুঁজে উষ্ণতা,
আগুনের পাশে বসে গল্পে বাড়ে ঘনিষ্ঠতা।
মাটির ঘ্রাণে মিশে থাকে খেজুর রসের মিঠে,
পৌষের প্রভাত মানেই স্নিগ্ধতা আর নানান রকম পিঠে।
পৌষের বিকেলে আকাশ রাঙে কমলা-সোনালি রঙে,
মাঠ-প্রান্তর ভরে ওঠে রোদের শেষ ঢঙে।
পথের ধারে চা-দোকানে বসে গল্পের আসর,
হাসির সাথে ধোঁয়া ওঠে, উষ্ণ হয় মন-ঘর।
সূর্য ডোবে ধীরে ধীরে ধরনীর বুকে,
বিকেলের পৌষ মানেই নিরবে দোলায়, গহীন মনের চোখে।
ঘটা করে যেন সন্ধ্যায় নামে কুয়াশার রূপালি নূর,
দূর থেকে ভেসে আসে কানে আজানের কোমল সুর।
রাতে শীত বাড়ে, আগুন জ্বলে উনুনের ছোট্ট ঘরে,
গল্প-কথায় গলে যায় দিনের ক্লান্তি যেন সর।
চালের হাঁড়িতে ফুটে ওঠে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত,
শীতের রাতে শান্তি নেমে দীর্ঘ হয় রাত।
বাইরে কুয়াশা ঘন, ভেতরে আলো-ছায়া,
কনকনে শীত শেখায় কাছাকাছি থাকার মায়া।
পৌষের হাওয়া শিখিয়ে দেয় ভালোবাসার মানে,
ভালোবাসা মানে দখল নয়, শুধু পাশে থাকা প্রাণে।

লেখক: বিশিষ্ট কবি, ঢাকা

আজ আর কেউ নাই

-মাজহারুল ইসলাম পলিন

চলো তবে ভেস্তে গেলো সকল আয়োজন।
একা হতেই এসেছি একাকিত্বের পূরণ।
রাশি রাশি সোনালি স্বপ্ন বুনার স্বাদ।
গহীন সেই স্বপ্নদের খেই হারানো বুনিয়াদ।

কী দারুণ তৃষ্ণা জেগেছিলো তোমার পাখনায়!
আর্যভট্টের শূন্যই দেখি সেদিনের ব্যাকুলতায়।

নাই তব কেহ নাই-
আজিকার একেলায়।
আঁখি পানে জল
অবসান কীসে বল?
নারে আর পারি কই
হতে এলে সই।
মিলিত হবো বাসরে,
ভেসেছি বিষাদ সাগরে।
নাই রে আজ সমস্ত একলাই
মনোহর এ চাটগাঁয়,
মনে লয় ঢলোতে মিলাই।
পশ্চাতে ঢলো নদী,
সাঙ্গুর জোয়ারে।
অগ্রহায়ণ কুহেলী লেগেছে দোয়ারে।

তুমিহীন সব লীন।
বিতৃষ্ণা বেঁচে থাকায়।
বিরক্ত লাগে সব
আশেপাশে যতসব।
প্রিয় পেশা সখের নেশা।
তাম্বুল মুখে পুড়ে
দূরের পর্বত জুরে।
কত গান বেগবান,
আজ সব হল ম্লান।।
বুক ভরে সুর ধরে,
পল্লবে অশ্রু খেলা করে।
আজ আর কেউ নাই
একদমই কেউ নাই।

লেখক: কবি ও শিক্ষক
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

অধিক শোকে পাথর

-সানজিদা রহমান আইরিন

ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে আঁধার কেটে গেছে,
পাখপাখালির কিচিরমিচির ডাকে
পৃথিবী তার নিরবতা ভেঙেছে।
বেলী ফুলের সুভাষ ছড়িয়ে পড়েছে বাড়ির আঙিনায়।

আমি বিছানা ছেড়ে ওঠে খুলে দিলাম দ্বার।
হালকা বাতাস যেন ফুলের গন্ধ আরও বাড়িয়ে দিলো।
ইতিমধ্যে পৃথিবীও ফিরে পেলো তার পুরো আলো।
পৃথিবীর আঁধার কেটে গেলেও,
দীর্ঘ ষোলোটি বছরেও কাটেনি আমার জীবনের আঁধার।

মনটা ভীষণ জ্বালাপোড়া করছে।
বাবার কথা মনে পড়ছে।
ঠিক এমনই একটা দিনে বাবাকে হারিয়েছিলাম।
তারপর মা নিজেকে নিয়ে ভাবেনি দ্বিতীয়বার।
মাঝেমধ্যে মানুষটার জন্য বড্ড মায়া হয়।

হঠাৎ আনমনে গড়িয়ে পড়লো চোখের জল।
অমনি সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মা।
বাড়িয়ে দিলো শাড়ির আঁচল।

কাঁদিস না মা।
আমিও যদি না থাকি তবে,
তোর চোখের জল মুছে দেবে কে?

কষ্ট পেলে কে না কাঁদে মা?
মানুষ কাঁদে আকাশও কাঁদে।
আকাশের কষ্ট গুলো বাদল হয়ে নামে।

কান্না মুছে দেওয়ার মানুষ না থাকলে কাঁদতে নেই।
নিজের কান্না নিজে মুছার যন্ত্রণা যে অধিক হয় রে মা।
আজ আমি আছি কাল তো নাও থাকতে পারি।
আকাশ কাঁদে কারণ তার জন্য সাগর বুক পেতে রাখে।
আকাশের কান্না গুলো বৃথা যায় না,
সাগর তা সযত্নে আগলে রাখে।
আমিও যদি না থাকি তবে কিভাবে সামলাবি তুই নিজেকে?

আমি চোখের পানি মুছে নিলাম।
মা খুশি হয়ে কপালে চুমু এঁকে দিলো।
সত্যিই বাবা চলে যাওয়ার পর এত দুঃখ-কষ্টের মাঝেও
মা কে কখনও কাঁদতে দেখিনি।
সবসময় নিজেকে সামলে নিয়েছে,
সামলে রেখেছে আমাকেও।

শুনেছি অতি শোকে নাকি মানুষ পাথর হয়ে যায়।
হয়তো মা ও তাই হয়েছে।

লেখক: শিক্ষার্থী, স্নাতক (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ, রাষ্টবিজ্ঞান বিভাগ,
কুয়াইশ বুড়িশ্চর শেখ মুহাম্মদ সিটি কর্পোরেশন কলেজ,
রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম

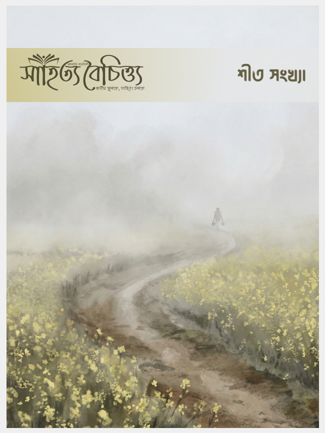

+8801540-101565 +8801755-867468
www.sahittabaicitta.com sbaicittabd
sahityabaicittabd20 sahityabaicittabd20